গল্প

সরীসৃপ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরীসৃপ

চারদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরি করিতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে। চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি-ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোনোদিন কোনো দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত, আজীবন। তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়ত, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরে প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভালোমানুষের মতোই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়ত, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

.

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানা রকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি-সাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল সেদিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্ত ভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে বাঁচানোই ছিল উচিত তাহার মতো বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই-না-থাকা।

কোনো লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল, কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতের বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনের বৎসরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়িতে স্ফূর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোট দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, বৌমাকে পাহারা দিস বুনো।

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রী-জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চারুর দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন-কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মতো তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, চুপ। চুপ! বাবার হুকুম। এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মতো ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, শহরের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোনো সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনি উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্বস্ব গেছে, যাক, কী আর করব;–সবই মানুষের কপাল। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ্য করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল,-নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয় ভালো লাগছে না, ভাই?

বেশ লাগছে।

চারুর ছোট বোন পরী এক মাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভালো লাগিতেছিল না। এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালীদাদা। ডালনা নিশ্চয় ভালো হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতেই আমাকে রাঁধতে দিলে!

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, না বেঁধেছিস বেশ করেছিস বাপু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না?

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা এ কথা বললেও আমি বিশ্বাস করি নে দিদি!

চারু একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা নে, না করিস না করিস একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে।

আমিও কথাই বলছি।

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচখচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার? বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা? আমি যেন ওর ইয়ার! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি, দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়!

বনমালী বলিল, ছেলেমানুষ, বোঝে না!

বোঝে না? হুঁঃ, কচি খুকি কিনা বোঝে না! বোঝে সব, সব বুঝে ও এমনি করে এ আর আমি টের পাই নে! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশ। টাকা পাঠিয়ে দেয়নি!

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সী পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কী সর্বনাশ হত বলো তো!

তা বৈকি। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখনি চারুদি, বিক্রি করেছিলে।

ওমা, সে কী? বাড়ি আমি বিক্রি করলাম কখন?

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো, তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার পাঁচ বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রি করেছ। বরাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কী বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, তুমি হাসছ, তাই বলো!

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামি মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, আমি বলি কী, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই-বা করবে কী; তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকিটা আমাকে দাও। তোমার ত্রিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমি-জায়গা যা

আছে দু-চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোনোকিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া বলিল, তুমি এ বাড়ি বিক্রি করতে চাও? খেপেছ!

চারু সভয়ে বলিল, কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে!

আমার টাকা চুলোয় যাক।

চারু আরো ভয় পাইয়া বলিল, রাগ করো না ভাই। মেয়েমানুষ কিছুই তো বুঝি নে!

বনমালী বলিল, ভুবনের বাড়ি বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে? ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না। সময়টা, কি জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই। ছাড়িয়ে নেব।

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, তারপর?

ভুবনের বাড়ি ভুবন ফিরে পাবে।

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?

ভুবনের কাছে জমা থাকবে।

এ কথা কেহ বিশ্বাস করে! নিমূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, কেঁদো না চারুদি। আমি কি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালবাসতে।

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আর কোনো আশা নাই।

আমি যদি তোমার মনে কোনোদিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?

চারু চোর বনিয়া গেল–দির কথা বলছি।

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরো গম্ভীর হইয়া বলিল, ভুবন কোথায় চারুদি?

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, ও ভুবন, ভুবন! একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

.

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আর আসব না দিদি।

আরো এক মাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস-দাসী ও মোট-বহর লইয়া শহরের ভিতরের বাড়ি ছাড়িয়া চারুর শহরতলির বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?

বনমালী বলিল, অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কী করে, চারুদি? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দুখানা ঘর তুলব ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।

চারুকে বলিতে হইল, আহা আসবে বৈকি, সে কী কথা, বেশ করেছ।

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুইশ দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পেছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, অসুবিধে হচ্ছে চারুদি?

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়।

না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।

কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বৈকি!

দেশে কি বাড়ি ঘর দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব?

হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমি-জায়গা আছে, খাজনা পাওনা, ফসল পাওনা, সব লুটেপুটে নিচ্ছে। নিজে থাকলে লোকসানটা রদ হত।

জমি! জমি কই দেশে? কিছু কি আর আছে ভাই, আমার সর্বস্ব গেছে।

বনমালী তখনকার মতো চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, হ্যাঁ রে, ওরা কি যাবে না?

কোথায় যাবে?

যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার? ক-দিন দ্যাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।

তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ওসব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।

.

কয়েক দিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও?

আমায় বলনি কেন চারুদি? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্মকর্মে আমি বাধা দেব কেন?

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে একপরত। মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, কই, তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। মাসিকে বলছিলাম, স্বামী-শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার এক পা কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসিমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভালো লাগে না। তবু, দেশ-বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হত। হায়রে কপাল, ওর আবার দেশ বেড়ানো! চারু কাদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কী আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদির ভারটা। আর এমন কী গুরু!

কাঁকর বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ ঘাসের শিষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাইয়ের মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত! তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো! কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে!

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, অমন করে কাঁদিস নে পরী; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।

হেমলতা বনমালীর সান্তনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

ওকে এখন ওসব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি একটু কাঁদতেও পেরেছে রে! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।

পরী আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দেখো কী নির্মম; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না!

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম লইয়া পরী বলিল, ও মাসিমা, দিদি কী করছে দেখুন।

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

ধর তো, দেখেই আসি একবার।

বনমালী হাত বাড়াইল না।

আমি দেখে আসছি।

তুই এখানে বোস। পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে একরকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে লইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এসব তাহার ভালো লাগে না–সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি! তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোনো প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁজে শেষে কি তাঁর তালু জ্বলিবে?

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, দরজা খোলো মা, দরজা খোলো, ওসব কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজি তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, তোর ছেলেটা তো বেশ। হয়েছে রে।

থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সঙ্গত; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনোদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ্য করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে, পরী?

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, কী লেগে থাকবে? কিছু না।

তুই পাউডার মেখেছিস?

পরী জোরে নিশ্বাস লইয়া বলিল, মেখেছিই তো, একশ বার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন?

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে। হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমতো বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, আমার মতো অবস্থা মাসিমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনো দিকে কূল-কিনারা নেই মাসিমা, আমি অকূলে ডুবেছি।

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কী করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখ।

মাথা চারু ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে লইয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোন দিক সামলাইবে!

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, কিছু রেখে গেছে?

না।

কিছু না? পোস্টাফিসে, ব্যাংকে, তোর নামে কিছুই রেখে যায়নি?

কী রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি? মাস গেলে হাত-খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাততো, রেখে যাবে!

আমি যা দিয়েছিলাম?

শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে-খাট-পালঙ্ক ছাড়া।

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, তোর গয়নাও দেয়নি নাকি? তোকে যে আমি তের-চৌদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে!

কিচ্ছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্স খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।

এমন চামার! তা, আর দুটো মাস তুই ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।

বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভালো লাগল না।

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, থাকতে ভালো লাগল না! মেয়েমানুষের অত ভালো লাগা মন্দ লাগা কী লো, যা, কালকেই ফিরে যা তুই,-বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।

পরী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের। একটা রোজগার করে? তাদের দিয়ে যেতে হবে না? ও বাড়ি আমি আর যাচ্ছি না বাপু, হ্যাঁ।

চারু আগুন হইয়া বলিল, ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি? তোকে খাওয়াবে কে শুনি? আমি! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।

আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি, বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি! ভাবতে হবে না তো আমাদের বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদী?

তিন দিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত-পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

দেখ পরী, এত বাড় ভালো নয়।

নয় তো নয়, কী হবে?

খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি?

সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।

চারু বনমালীর শরণ নিল।

মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, আহা, যাবে বৈকি চারুদি, যাবে। দুদিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কী?

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখ ভার করিয়া বলিল, লেগেছ তো পিছনে? জগতে কারো ভালো করতে নেই।

তুই আবার কবে আমার কী ভালো করলি লো?

এখানে আছ কার জন্য? ভেবে দেখছ একবার?

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, তোর জন্য, না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস!

তাই।

চট করিয়া ঘুরিয়া দম দম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না, এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশি দিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশি কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, খান, পেট আপনার ভরেনি। কখখনো ভরেনি। আমি বুঝি না! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?

বলে, কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা বেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন, বেশ রাঁধি।

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আবদারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও। খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভালো হবে?

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন।

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপি চুপি ঘরে আসে।

বলে, কী চাই বলুন।

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, পা কামড়াচ্ছে-কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।

পরী বলে, কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানি নে?

অবশ্য পা টেপে না, অতবোকা পরী নয়; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তনের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না। ভাবে, কী মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে!

.

একদিন একটু বেশি রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজ-খবর লইলে পরী খুশি হইবে। বনমালীকে ও যে-রকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুশি রাখা দরকার বৈকি!

নিশুতি রাত, বাড়িটা এক-একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কী জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে!

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দুপা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে

নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়সড় হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দুহাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কী বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন-ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড়-খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, এ কী মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া লইল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যণ্টা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে।

হয়তো ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, ভুবন। আর বাড়ি নিয়ে করবে কী চারুদি? পরীকেই দিয়ে দিলাম।

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া-আসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া

সে যাহার চোখ দুটো উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে। বাড়ির ঝিয়ের চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠার বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহ চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে। যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বারবার ভাবিয়া এবং শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ লইয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণি দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করিল ইহার আকস্মিকতা, ইহার অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালোবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাত ছেলেমানুষি খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ওসব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারো মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন। তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যেদিকে যেভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কী আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম। বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনো কোনো আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই! তার নৈকট্যকে, তার। নির্বাক আবেদনকে, তার দু-চোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তাহার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত!

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, ইহার চেয়ে সে-ই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু-তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না-চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। ইহার কোনোটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির

ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনি অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন–এ রকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলো স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল, নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনো আর একজন বাকি।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী একরকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায়-চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপটপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, কী বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল!

বনমালী বলিল, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

হ্যাঁ। কদিন গরমে প্রাণটা গেছে–আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।

বনমালী আচমকা বলিল, ক্ষেন্তির মা দুশ টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?

চারু মাথা নাড়িল।

কাশী মাথায় থাক, তোদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কী? হুট বলতে ও যেখানে খুশি যেতে পারে, আমরা পারি নে। আমাদের মায়া-মমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে–

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

.

তারকেশ্বর রওয়ানা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোনো, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করার কী দরকার কে জানে! কথা কি শুনবে মেয়ে! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা করে দেখো ভাই।

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়ে একটা আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রীনিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বৌয়ের কলেরা হইয়াছে। তাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বৌটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে লইয়াই মরিয়া হইয়া সে ধরনা দিতে আসিয়াছে। বৌটির নাম কনক, বয়স অল্প; গুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মতো।

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বৈকি।

হ্যাঁ মাসিমা, কদিন থাকবেন আপনি?

চারু হিসাব করিয়া বলিল, আজ নিয়ে হল তিন দিন, আরো পাঁচ-ছ দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়। কিন্তু দেখি কটা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্ন-আত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখানে, পা গুটিয়েই বোসোনা, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কীভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কী করে জানব? এতকাল একটা জমিদারি চালিয়ে এলাম, আমার কি ওসব ভুল হয় বাছা? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের। পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়িতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ি মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চা লইয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, আপনি তাহলে আছেন কদিন? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসিমা। বাবার দয়া হতে দুদিন লাগে কি তিন দিন লাগে ঠিক তো কিছু। নেই, একা কী করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর–

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, মাসিমাকে প্রণাম কর শিশু।

কাল কনক ধরনা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ।

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীবাসের কর্তা একটা গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, যাও না হে ছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি? আচ্ছা। বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোনো ভয় নেই–আমি বলছি কোনো ভয় নেই। রোগি হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন।

হলে আর তোমায় বলে কী হবে বাপু? এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্তা চোখ লাল করিয়া একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোনো জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

মাসিমা, দেখুন না, এরা জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না।

চারু বলিল, তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়? তারপর ভৎর্সনা করিয়া বলিল, এখনো একজন ডাক্তার ডাকনি, করেছ কী? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা। বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ি লইয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, আমার পাথরের বাটিটা?

বাটিটা বৌদি নোংরা করে ফেলেছে, মাসিমা।

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, কেন নোংরা করেছে? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাপু। আচ্ছা, যা করেছে, বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও।

একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, এইতে দাও। অনেক পরত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু সেটা আলগোছে তুলিয়া লইল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া লইয়া চোরের মতো কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া ধুলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, এক হাতে নয়, দুহাতে ধর। ছেলের মা তুই, তোর তো সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।

দুটো ভাত দে দিদি!

ভাত নয় প্রসাদ, খা।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্য-পান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা লইয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে এক ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে সকলে ভালবেসেছে ভুবন?

ভুবন অস্বীকার করিল।

তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন? আমায় ঘরে। বন্ধ করে রেখেছিল।

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, কী রে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কী রকম দেখলি বল তো?

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালোও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার বোনপোকে ঠিক সময়মতো না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউহাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুরবেলা ভুবন চুপি চুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

কি জান মা, মার মতো কেউ কি করে?

চারু বলিল, আমি চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে? মারধর করেনি তো কেউ?

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

না, মারধর কেউ করেনি।

.

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরানী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়,-মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষভাবে সুন্দরী দেখিল,-অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল।

ভাবিল, না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বৈ তো নয়।

শরীরটা চারুর ভালো লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোনোমতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বৌটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিনঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া। আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবত মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাকে বলিল, ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শিগগির।

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল এক ঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কী যে সে বকিতে লাগিল কেহ তার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক, বনমালী বারকতক তাকে শুনাইয়া দিল যে। ভুবনের জন্য তার কোনো ভয় নাই, ভুবনের ভার সে লইল।

পরীর মনে হইল তাহারও কিছু বলা দরকার।

ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনো। কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে? চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, যাহার বিধান তারও বোধ হয় ক্ষমতা নাই সে-শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

.

কদিন পরী খুব কাঁদিল। দিদি আমায় বড় ভালোবাসত, এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

এক দিনের তরে সুখ কাকে বলে জানেনি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে-

বনমালী বলিল, শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।

পরী বলিল, হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।

অথচ একটু যত্ন হয়নি!

না। নিলে তো কারো যত্ন! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে প্রাণটা দিয়েছে।

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, বড় ঘা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কী বল?

হলে না কেন?

পরী হাসিয়া বলিল, বাহ, বেশ; আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব!

বনমালী বলিল, তাই নাকি!

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনো পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া লইল। ছোট একটি পান সাজিয়া মুখে লইয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালী বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

শোনো। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিং বোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো?

আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারি কাঁদছে পরী।

পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।

পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।

আমাকে সেজেগুঁজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয়।

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী।

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া লইল। চোখ পাকাইয়া বলিল, তোকে না পাঁচশ বার বলেছি বাবুর ধারে-কাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না?

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, খোকাকে আন তো পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।

মরণ তোমার! ভয় আবার কিসের?

তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু। দেখলে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদূর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।

পরী হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস। তার পর কী হল বল।

ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, না রে পদ্ম? লজ্জায় মরি দিদিমণি।

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, আচ্ছা, পরের ছেলেকে তুমি এত ভালোবাসলে কী করে বলো তো? তোমার হিংসা হয় না?

বনমালী হাসিয়া বলিল, না, দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব

কী? বরং তোর ছেলে বলে ভালোই বাসি।

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

এ কী পরিণাম! সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক!

আরশি কি প্রত্যহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালোবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কী করিয়া? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আরশিতে নিজেকে তাহার প্রত্যহ নূতন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক-একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এর মধ্যে পুরনো হইয়া গেল। মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায়?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনো চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড় মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোনো স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুত গতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া লয়। তাহার। উপভোগ যেমন প্রখর তেমনি অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রস-বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তার প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য, অবুঝ, বহুকালস্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারী-মনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহমন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে লইয়া খেলা করিত; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তাহার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর একগ্লাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাকখাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নিচে সুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা। অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, শোধ নিস, শোধ নিস; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস।

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া ওঠে, কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা!

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে এ-বারান্দা ও-বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে ডাকিয়া তুলিল।

ভুবন কী রকম করছে দেখবে চলো।

কী রকম করছে?

কাঁদছে আর ছটফট করছে। অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে?

আমি।

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, দ্যাখো তো কী করলে! নিভিয়ে দাও।

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

ঘরে যাও বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোলাকে লজ্জা দিয়া আলোর নিচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কে রে? পরী নাকি? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কী করছিস পরী? বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে!

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ কী কাণ্ড মা! আঁ?

পরদিনটা কোনোরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, পরীকে পাঠিয়ে দে বনমালী।

দেব। এখন থাক।

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস?

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, দুটি খায়, ও আবার বোঝা কী মা?

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনির মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা। গরম না করিবার উপদেশটা পর্যন্ত তাহার স্মরণ রহিল না।

দুদিন পরে আবার বলিলেন, যে রাগী মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না। বাপু। কিন্তু চোখ মেলে তো এ আর দেখা যায় না বনমালী!

কী হয়েছে?

রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল?

বনমালী হাসিয়া বলিল, না। আমার রাগ হবে না, বলো।

হেমলতা গলা নিচু করিয়া বলিলেন, পরীর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস। ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কাঁকড়া চুল?

জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুরবেলা সেদিন চোরের মতো পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক চেয়ে ওদিক চেয়ে নিচে নেমে গেল।

কবে?

পরশু।

বনমালী হাসিয়া বলিল, পরশু তো? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার। জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারি চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা! পরী সেরকম নয়।

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত। আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভালো করিতে যাওয়া কি তাহার সাজে?

এদিকে বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকব? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ব? পায়ে ধরে যে দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব?

এর মধ্যে শেষ কল্পনা দুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালোবাসে।

অন্তত তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোনো কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে–ভুবনকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে লইয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মতো একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারি সুখী।

বলে, ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, আগে থাকতে আমার হাতে পড়লে এ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও।

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত।

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া লইতেছেন।

বনমালী বলে, আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।

হেমলতা বলেন, আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস।

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বার বার হলঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে ছটা বাজিতে চলিল কী করিয়া?

ঘড়ির ডায়ালটা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাটা আর ছোট কাটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারি কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, ভেঙে ফেলে দেব, পাজি কোথাকার!

ঘড়িতে ছটা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, ছটা বাজল মামা।

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর একপ্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। ছটার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মতো ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়তো কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশি করার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে। ছিল, শুধু এই জন্য।

ভুবনকে সে যে ভালো বলিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরো একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর

মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, একটা বাড়ি নিবি, ভুবন?

নেব মামা।

আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোট বাড়ি সম্প্রতি একপ্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়িটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরী তো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিত কুকুরীর। মতো অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাচকা টানে কোলে তুলিয়া লইয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাশিতে কাশিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, কী করে এমন হল দিদিমণি?

পরী ফিসফিস করিয়া বলিল বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে–

পদ্ম চোখ মিটমিট করিয়া বলিল, সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। দো বেড়ালটার হয়েছিল দেখনি? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুজে রক্তে–!

.

কয়েকদিন পর হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে লইয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপিচুপি ভুবনকে বলিল, মার কাছে যাবি, ভুবন?

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, যাব।

এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

মামাকে বলে যাই?

তবেই তুমি গিয়েছ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস? ছাই দেবে!

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল।

পরী বলিল, কাউকে কিছু বলিস নে কিন্তু, খবরদার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছন দিকে গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হনহন করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজহাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফাস্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।

ভুবন বলিল, আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসি। পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, মামা দিয়েছে। কটা বেজেছে জান? তিনটে বেজেছে।

ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।

ভুবন বলিল, আচ্ছা।

রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো? ভাঙিয়ে কাল খাবার কিনিস।

মা স্টেশনে আসবে, মাসি?

আসবে।

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

না না এখখুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?

ভুবন? ভুবনের আমি কী জানি! বাড়ি নেই?

বনমালী হাকিল, কেষ্ট, এদিকে আয়।

কেষ্ট ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।

কেষ্ট কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কেন বাবু?

রাতদুপুরে তুই দোতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার নশ টাকা চুরি গেছে।

ঝি-চাকর আশ্রিত-আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।

দোতলায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল, বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া-মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নিচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।

নিচে ভাঁড়ারের পাশে এক সারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-চাকরেরও নিচে, বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, আমি কী করেছি? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কাহার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় লইয়াছে।

পরীকে নিচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, কী গো, ওপর থেকে তাড়িয়ে দিলে? বড়লোকের মর্জি দিদি, কী করবে বলো।

পরী বলিল, কী যে বল তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে? আমি যেচে এসেছি। ওপরে যে সব ম্লেচ্ছাচার-বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষাল না।

ক্ষেন্তি বলিল, ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল! আজ যে রানী, কাল সে দাসী। হায় রে কপাল!

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, কাঁদছ কেন? সয়ে যাবে।

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

শোনো বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—

পরী বাধা দিয়া বলিল, থাক। তুমি যাও।

শোনোই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বললে, নিচেটা সঁতসেঁতে, তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে, কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি–

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হালকা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোক গিলিয়া সে বলিল, ব্যাপার বুঝে আমি রাজি হলাম না। নিচে মার কাছেই রইলাম।

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, আমার জ্বর আসছে, তুমি যাও ভাই।

.

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হারে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?

বনমালী বলিল, আপদ গেছে, যাক।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।